এইডস ২
...বেয়ার জীবনকাহিনী
গুলেনবেরি সিনড্রোম ৬
ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৭ সংখ্যা ২

অগ্রহায়ণ ১৪০৫

মাতৃমৃত্যু রোধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের প্রয়োজনীয়তা

দেওয়ান মোঃ নকিবুল ইসলাম

১৯৮৭ সালে লাতিন আমেরিকার কোস্টারিকায় অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য সম্মেলনে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে প্রতিবছর ২৮ মে বিশ্বব্যাপি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখন পর্যন্ত নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ২৮ মে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্টে দেখা যায়: সারাবিশ্বে প্রতিবছর ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার মহিলা সন্তান জন্মদানকালে বা গর্ভসংক্রান্ত জটিলতায় মারা যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই মৃত্যুর হার অনেক বেশি। সারাবিশ্বে যতজন মহিলা গর্ভসংক্রান্ত জটিলতায় মারা যাচ্ছে তার প্রায় ৯৯ শতাংশ ঘটছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়: এশিয়াতে গর্ভজনিত কারণে মাতৃমৃত্যুর হার অনেক বেশি। এশিয়াতে প্রতিবছর ৩ লক্ষ ২৩ হাজার মহিলা গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতায় মারা যায়। আফ্রিকাতে এই সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার, লাতিন আমেরিকায় ২৩ হাজার, ইউরোপে ৩ হাজার এবং উত্তর আমেরিকায় মাত্র ৫০০ জন।

বাংলাদেশে এই মৃত্যুর হার আরও ভয়াবহ। বাংলাদেশে প্রতিঘন্টায় ৩ জন এবং বছরে প্রায় ২৮০০০ মহিলা গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতায় মারা যাচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ'৯৮ উপলক্ষে ইউনিসেফ-এর প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়: বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর জন্মদানকারী মায়েদের মধ্যে ৪.৫ জন মারা যাচ্ছে—যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় এই হার মাত্র ০.৮। গত দুই দশকে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা ও সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি যে-সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, সেই তুলনায় মাতৃমৃত্যু রোধে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ ২০০০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু যদি মাতৃমৃত্যুর বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে, তবে এই লক্ষ্যে পৌছানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মাতৃমৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (২৬%), গর্ভপাত (২১%), একলাম্পশিয়া (১৬%), সংক্রমণ (১১%), বাধাগ্রস্থ প্রসব (৮%) এবং অন্যান্য (১৮%)। মাতৃমৃত্যু রোধে সফলতা অর্জন করতে না পারার জন্য সাধারণত অল্পবয়সে সন্তান ধারণ, অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ প্রসব করানোর ব্যবস্থা না-থাকা।

মাতৃমৃত্যুর এসব কারণগুলোর সবগুলোই প্রতিরোধ করা যায়, গর্ভবতী মাকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, নিয়মিত প্রসবপূর্ব যত্ন এবং প্রসবকালীন উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশে জটিল প্রসবের ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসব সেবা ও চিকিৎসার অপ্রতুল ব্যবস্থা রয়েছে। গর্ভাবস্থায় এসব সেবা ও চিকিৎসা-সুবিধার উন্নত ব্যবস্থা থাকার কারণেই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় প্রতিবছর মাতৃমৃত্যুর হার এত কম।

মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহের আনুপাতিক হার

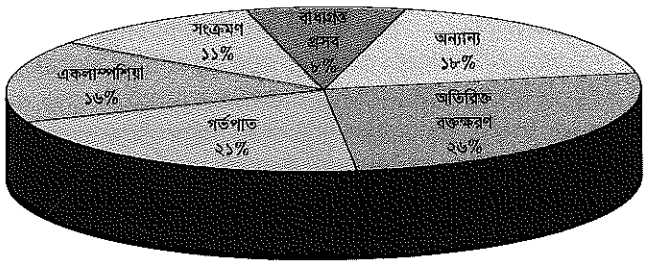

বাংলাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে কেবলমাত্র একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আছে। কিন্তু ৪৪২০টি ইউনিয়নের সবগুলিতে নেই। এই পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে জটিল সন্তান প্রসব করানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি সব থানা হাসপাতালগুলিতেও এই ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, গ্রাম থেকে এই কেন্দ্রগুলি দূরে অবস্থিত

(৩-এর পাতায় দেখুন)

নারী ও এইডস

সাইফুর রহমান

বর্তমান বিশ্বে এইডস একটি ব্যাপক গণস্বাস্থ্য সমস্যা। এইডস এমন একটি সমস্যা যা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে খুব দ্রুত গতিতে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। শুরুতে অর্থাৎ ১৯৮০ সালের দিকে এই রোগটিকে শুধুমাত্র সমকামীদের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো।

এই রোগটিকে বলা হয় এ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম বা এইডস (AIDS)। এটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। বর্তমান বিশ্বে এইডস মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ লোক এ-রোগে মারা গেছে। UNAIDS-এর তথ্য অনুযায়ী আরও প্রায় ৩ কোটি মানুষ এ-রোগের জীবাণু বহন করছে—যার প্রায় অর্ধেকই মহিলা। মহিলাদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

মহিলারা কেন ঝুকিপূর্ণ এবং কেন অধিক হারে সংক্রামিত হচ্ছে তা সবারই জানা প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংসকারী ভাইরাস এইচআইভি (HIV) হচ্ছে এইডস রোগের কারণ। এই ভাইরাস ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে এবং এর ফলে সংক্রামিত ব্যক্তির অন্যান্য রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সুপ্ত থাকার সময়কাল গড়ে ৬ থেকে ১০ বৎসর।

এ-পর্যায়ে সংক্রামিত ব্যক্তি নিজের অজান্তেই অন্যের শরীরে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে, বীর্যে এবং যোনিরসে এই ভাইরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে এইচআইভি ভাইরাস-এর উপস্থিতি সনাক্ত করা যায়।

সাধারণত তিনটি প্রধান মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করে:
(১) সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে প্রতিরোধহীন যৌনমিলনে লিপ্ত হলে,
(২) সংক্রামিত ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শ ঘটলে এবং
(৩) সংক্রামিত মহিলা অন্তঃসত্বা হলে মা থেকে শিশুতে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। উল্লিখিত তিনটি প্রধান মাধ্যম ছাড়া আর কোনো উপায়ে এই ভাইরাস একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

বর্তমানে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান কারণ হিসেবে প্রতিরোধহীন এবং নিরাপত্তাহীন যৌনমিলনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। নারী-পুরুষের যৌনমিলন থেকে যখন এই ভাইরাস ছড়ায় তখন মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

মহিলাদের প্রজননতন্ত্র পুরুষদের থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে মহিলারা সবসময়ই যৌনমিলনে গ্রাহী সংগী। তাই একজন এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত মহিলার সংগে যদি একজন পুরুষের যৌনমিলন ঘটে তবে পুরুষটির আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত পুরুষের যদি কোনো মহিলার সাথে যৌনমিলন ঘটে তবে মহিলাটির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা ঝুঁকি পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে দ্বিগুণ বেশি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মহিলাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রায় একই রকম। মহিলারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে অসহায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা এইচআইভি বা এইডস থেকে নিজেদের রক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে কম ক্ষমতা রাখে। বেশিরভাগ মহিলাই যৌনমিলনে নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে বা তাদের সঙ্গীকে কনডম ব্যবহারে বাধ্য করতে পারে না। নিজে সংক্রামিত হলে পরিচর্যার নিশ্চয়তা থাকে না। বরং সংসারে মহিলারাই প্রধান পরিচর্যার কাজ করে থাকে। সুতরাং কেউ যদি এইডস-এ আক্রান্ত হয় তাহলে সে বোঝা তাকেই বহন করতে হয়।

বাংলাদেশের মহিলারা কেন ঝুঁকিপূর্ণ

সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের মহিলারা সামাজিকভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। একজন মহিলা জীবনের শুরু থেকেই এই অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হয়। একটি মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোথাও সে একটি ছেলের সমান সুযোগ পায় না। কারণ সমাজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। অপরিণত বয়সে বিবাহের কারণে যৌন-ইচ্ছায় মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বরং যৌন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, সন্তানের জন্মদান এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের সিদ্ধান্তকেই মহিলাদের মেনে নিতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তালাক বা পরিত্যক্ত হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে জীবন কাটাতে হয়। তাছাড়া, সমাজে তারা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়। বর্তমান সমাজে যৌন-নির্যাতনের হার বেড়ে গেছে এবং মেয়ে শিশুরাও যৌন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

মহিলারা পুরুষের যৌন-অভ্যাসের সমালোচনা করতে পারে না। উপরন্তু বিবাহিত পুরুষের ঘরের বাইরে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সমাজ অনেক সহনশীল। কিন্তু সেই পুরুষই যখন তার স্ত্রীকে কোনো যৌনরোগে আক্রান্ত করে তখন স্ত্রীকে সইতে হয় সবরকম বিড়ম্বনা। সুতরাং এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এইচআইভি/এইডস-এর মতো একটি মারাত্মক যৌনরোগে মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।

শিক্ষা

শিক্ষার দিক দিয়ে বাংলাদেশে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। এদেশে মহিলারাই বেশি নিরক্ষর। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবার থেকে প্রদত্ত তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা বৈষম্যমূলক। এর ফলে আনুষ্ঠানিক বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পেলেও মহিলারা অদক্ষ থেকে যায় এবং আর্থিকভাবে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

তাছাড়া, যৌনতা বিষয়ে পরিবার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানার কোনো সুযোগ না থাকায় শিক্ষিতা হয়েও মহিলারা এ-বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন এবং অন্যান্য নিরক্ষর মেয়েদের মত তাদেরও নির্ধারিত বয়সের পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এমন

কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি নেই যা শুধু এইচআইভি/এইডস বিষয়ে মহিলাদের ঝুঁকিকে চিহ্নিত করে। তাই এইচআইভি/এইডস বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ও উপকরণের অভাব থাকায় মহিলাদের এ-বিষয়ে জ্ঞান অত্যন্ত কম।

স্বাস্থ্য

মহিলাদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের নিজ পরিবার গতানুগতিকভাবেই উদাসীন। পরিবারে মহিলাদের রক্তাল্পতা এবং অপুষ্টি যেন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাস্থ্য-চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন সুযোগ এখানে কম এবং তা থাকলেও সে-সুযোগ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। তাছাড়া, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী যদি পুরুষ হয় তবে তার কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে তাদের উৎসাহ থাকে না। একজন মহিলা তার নিজের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের, যেমন: স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী দ্বারা। সেবা কেন্দ্রগুলোতে মহিলারা যৌনরোগ ও এইডস-এর মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিতে সংকোচ বোধ করে। কাজেই এই রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শের অভাবে ক্রমেই তাদের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশ সরকার এইডস প্রতিরোধে এখনও পিছিয়ে আছে। অবশ্য প্রতিরোধমূলক কর্মকান্ড জোরদার করার চেষ্টা চলছে। তবে তা নির্ভর করছে এইচআইভি/এইডস-এর ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে চাহিদা মাফিক কর্মসূচি গ্রহণের ওপর। নারী সম্প্রদায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এমনই একটি জনগোষ্ঠী। এইচআইভি/এইডস-এর মতো জটিল সমস্যার অভিশাপ থেকে নারীদের রক্ষার জন্য প্রয়োজন মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, তাদের চাহিদা মাফিক সেবার ব্যবস্থা, সামাজিকভাবে নারীর আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি, উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার আয়োজন এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশের মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের প্রতি পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে শেষোক্তদের সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা। নারীদের প্রতি পুরুষদের দায়িত্বশীলতা বাড়িয়ে একজন নারীকে এইচআইভি/এইডস-এর মতো একটি জটিল রোগের বা সমস্যার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা যায়।

মাতৃমৃত্যু

(১ম পাতার পর)

এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। তাই কখনো ভ্যানে, কখনো গরুর গাড়ি বা রিক্সায় করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার পথেই অনেক মহিলা মৃত্যুবরণ করে। গ্রামের সকল মানুষের মধ্যে গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা, ইউনিয়ন ও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে জটিল প্রসবের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা গেলে মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বেশির ভাগ প্রসবের জন্য নির্ভর করতে হয় দাইদের ওপর। গ্রামে দাইরাই সন্তান প্রসবের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট'৯৭ অনুযায়ী ১৪ শতাংশ প্রসব করানো হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই, ডাক্তার অথবা নার্স দ্বারা, বাকি ৮৬ শতাংশ মহিলার সন্তান প্রসবে সহায়তা করে প্রশিক্ষণহীন দাই, শাশুড়ী, মা, চাচী ও খালাগণ।

এই প্রশিক্ষণহীন দাইরা সাধারণত অপরিস্কার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে—যার দ্বারা জীবাণু সংক্রমণের ফলে বহু মহিলা মারা যায়। এছাড়া এসব দাইরা কিভাবে সংক্রমণ রোধ করা যায়, কিভাবে পরিস্কারভাবে ও নিরাপদে নাড়ী কাটা যায়, একলাম্পশিয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি বোঝে না; বুঝতে পারে না বাচ্চার অবস্থান। অপরদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের প্রশিক্ষণ থাকায় এসব বুঝতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইরা জানে প্রসবকালীন গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে কখন কাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ফলে সময়মত ব্যবস্থা নেওয়ায় বেঁচে যায় অনেক মূল্যবান প্রাণ।

মাতৃমৃত্যু রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, গ্রাম-পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে এটা করা সহজ নয়। তাই প্রথমে গ্রামের ৮৬ শতাংশ মহিলা যাদের মাধ্যমে প্রসব করানোর কাজটি সম্পন্ন করে সেই দাইদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজকে আরও উন্নতমানের করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর কারণগুলোর সবই প্রতিরোধযোগ্য। প্রতিটি প্রসব যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের দ্বারা করানো যায় তাহলে রক্তক্ষরণ, গর্ভপাত, একলাম্পশিয়া, সংক্রমণ, বাধাগ্রস্থ প্রসব এবং অন্যান্য কারণে মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে।

আমাদের দেশে প্রতিটি ইউনিয়নে মাত্র ১৫ জন দাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতোমধ্যে মারা গেছেন। আবার অনেকে বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না। বর্তমানে কোনো ইউনিয়নে ৪/৫ জনের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই পাওয়া যাবে না—যা লোকসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

মাতৃমৃত্যু কমিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নতুন করে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষিত দাই নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলে গ্রামের মায়েরা প্রসবকালীন সময়ে হাতের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই পাবে। তাছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ২৩৫০০ পরিবার কল্যাণ কর্মীসহ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় ৫০০০ মহিলা কর্মীদের সন্তান প্রসব করানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। এই কর্মীগণ গ্রামের মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করেন। তাই গ্রামের মহিলারা তাদের সব সময় হাতের কাছে পাবে। পাশাপাশি, সরকার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের ডেলিভারি-কিট সরবরাহ করা যেতে পারে। গ্রাম-পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পাশাপাশি থানা এবং জেলা-পর্যায়ে জটিল প্রসূতি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে থানা এবং জেলা-পর্যায়ে জরুরী প্রসূতি সেবার কয়েকটি প্রকল্প কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার এবং আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে ১৯৯৬ সনে মীরসরাই থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমনি একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার উক্ত উদ্যোগের সফল দিকগুলিকে বর্তমানে আরো পাঁচটি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং উচ্চতর পর্যায়ে সেবার মান ও পরিধি বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রাবেয়ার জীবনকাহিনী

মমতাজ বেগম
মহসীন আহমেদ

বাংলাদেশের আর দশটা শ্যামল সবুজ গ্রামের মত যশোর জেলার মনিরামপুর থানার আঠার পাখিয়া গ্রাম। আঠার পাখিয়া গ্রামের এক নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে রাবেয়া। পুতুল খেলার বয়স পেরুতে না পেরুতেই মাত্র ১২ বছর বয়সে রাবেয়ার বিয়ে হয় যায়। বিয়ে হয় একই গ্রামের আরেক নিম্নবিত্ত পরিবারে। বিয়ের পর মাত্র সাড়ে ৫ বছরের মধ্যে রাবেয়া ৪ বার গর্ভবতী হয় এবং তার জীবনের করুণ পরিণতি ঘটে। কেন এমনটি হলো?

রাবেয়া তার বিয়ের ৩ বছর পর অর্থাৎ তার বয়স যখন ১৫ বছর তখন প্রথম গর্ভ ধারণ করে। একজন গর্ভবতী মায়ের যে সেবা ও পরিচর্যা প্রয়োজন তার কোনোটাই সে পায়নি। প্রসবের জন্য সে তার বোনের বাড়িতে চলে যায় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন একজন গ্রাম্য দাই দ্বারা প্রসবের কাজটি সম্পন্ন করায়। একটি জীবিত ছেলে জন্ম নেয়, কিন্তু ৩ দিন পরই বাচ্চাটা মারা যায়। বাচ্চাটা বুকের দুধ টানতে পারতো না এবং গায়ের রং লাল-নীল হয়ে যেতো। রাবেয়া কোনো ধনুষ্টংকারের টিকা নেয়নি।

প্রথম সন্তান প্রসবের তিন মাস পর রাবেয়া দ্বিতীয় বারের মত গর্ভবতী হয়। গর্ভের তিন মাসের সময় গর্ভপাত হয়ে যায়। এবারও রাবেয়া পরিবারের বাইরের কোনো দাই বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারো সেবা পায়নি। গর্ভপাতের পর খুব শীঘ্রই রাবেয়া আবার ৩য় বার গর্ভধারণ করে।

গর্ভপাতের ১১ মাস পর সে আবারও একটি জীবিত ছেলে প্রসব করে। এবারও সে কোনো সেবা এবং পরিচর্যা পায়নি, ধনুষ্টংকারের টিকাও নেওয়া হয়নি। তবে এবার একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই দ্বারা প্রসব করানো হয়। এবারের বাচ্চাটাও বুকের দুধ টানতে পারতো না এবং শরীর লাল-নীল হয়ে যেতো। এক সপ্তাহ পর এই বাচ্চাটাও মারা যায়।

তৃতীয় সন্তান প্রসবের ৪ মাস পর রাবেয়া আবারও গর্ভধারণ করে। এবার খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে সে। কিছুই খেতে পারতো না। একজন মাঠকর্মীর সহায়তায় এবার অবশ্য রাবেয়া ধনুষ্টংকারের টিকা নিয়েছে। গর্ভের ৬ মাস থেকে তার পায়ে, হাতে এবং শরীরে পানি দেখা দেয়। চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করে (এসব হয়তো প্রি-একলাম্পশিয়ার লক্ষণ)। রাবেয়া এবার বাপের বাড়িতে চলে যায়। গর্ভের ৮ মাসের সময় ব্যথা ওঠে। দূর্ঘটনাক্রমে দাঁড়ানো অবস্থায় রাবেয়ার প্রসব হয়ে যায়। একটা কন্যা শিশু নাড়ী ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে মারা যায়। বাচ্চা প্রসবের পরও পেটে প্রসবব্যথার মত ব্যথা ছিলো। এবার আনা হলো একজন পাশ-করা ডাক্তার। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, পেটে আরেকটা বাচ্চা আছে। রাবেয়ার শরীরের যা অবস্থা তাতে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন। পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই (টিটিবিএ) আনার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই একটি মৃত সন্তান প্রসব করায়। রাবেয়া একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরীর একদম ঠান্ডা হয়ে আসে। এবার তাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে। হাসপাতালে তাকে স্যালাইন এবং রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তখন বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে। ফলে রাবেয়া মারা যায়।

গর্ভবতী অবস্থায় রাবেয়ার রক্তচাপ মাপা হয়নি। প্রস্রাব পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রি-একলাম্পশিয়ার লক্ষণ হিসেবে রাবেয়ার শরীরে পানি দেখা দিয়েছিলো। চোখে ঝাপসা দেখা হয়তোবা উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছিলো। রাবেয়ার প্রস্রাব পরীক্ষা করলে হয়তো প্রোটিন বা আমিষ ধরা পড়তো। এসবের জন্য রাবেয়ার প্রসবপূর্ব সেবাযত্নে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন এবং পরবর্তীকালে হাসপাতালে অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিরাপদ প্রসব করানোর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু হতভাগ্য রাবেয়ার কপালে এগুলোর কোনোটাই জোটেনি। গর্ভের ৮ মাসের সময় একটা কন্যা শিশু নাড়ী ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রাবেয়ার মৃত্যু সেদিনই হতে পারতো। কিন্তু সেদিন রাবেয়া ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। পরে একটি মৃত যমজ সন্তান প্রসব করে এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সে-সময় সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রাবেয়া Hypovolaemic shock-এর পর্যায়ে চলে যায় এবং নিস্তেজ ও ঠান্ডা হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরে অবশ্য হাসপাতালে নিয়ে রক্ত ও স্যালাইন দেওয়া হয়। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। চতুর্থ গর্ভাবস্থায় যদি রাবেয়ার সন্তান প্রসব হাসপাতালে করানো হতো, প্রসবের আগেই যদি রক্ত জোগাড় করে রাখা হতো এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা হতো তবে হয়তো রাবেয়াকে এভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। নিয়মিত প্রসবপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে গর্ভাবস্থায় প্রি-একলাম্পশিয়ার লক্ষণ, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন বা আমিষ যাওয়া ধরা পড়তো। উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। সবশেষে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিরাপদ প্রসবকার্য সমাধা করা যেতো। তাহলে রাবেয়ার জীবন অকালে ঝরে পড়তো না।

ঘটনার সম্ভাব্য বিশ্লেষণ

রাবেয়া একটি নিরক্ষর গরীব ঘরের মেয়ে। কৈশোর পেরুতে না পেরুতেই ১২ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়। গরীব ঘরের মেয়ে হিসেবে স্বভাবতই অপুষ্টি ছিলো তার নিত্য সাথী। অপুষ্ট মেয়েদের মাসিক দেরীতে হয়। সম্ভবত মাসিক শুরুর পূর্বেই অর্থাৎ

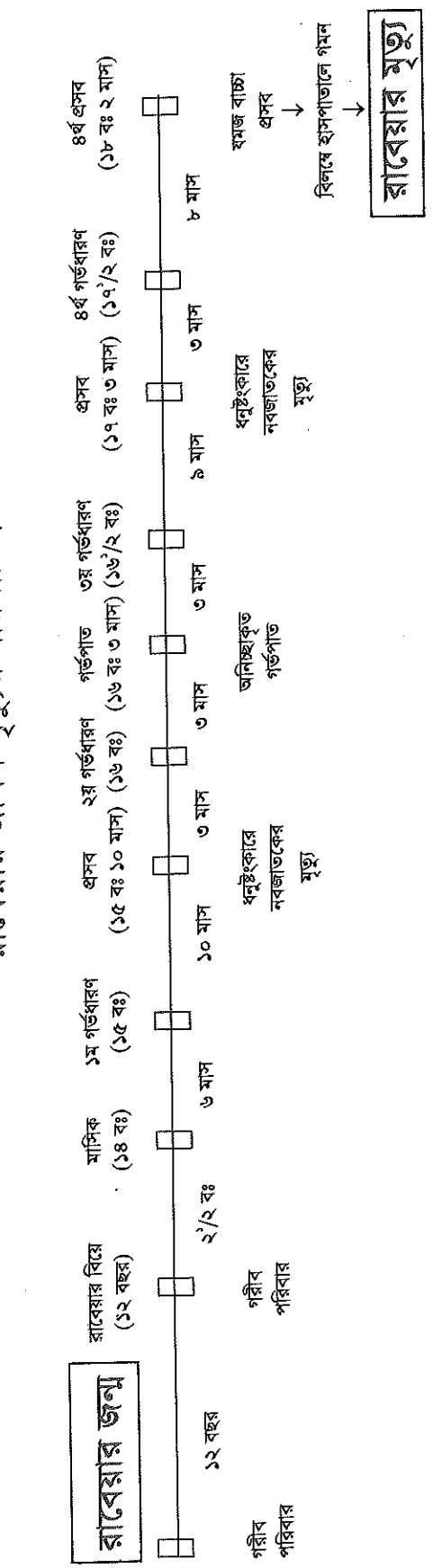

একেবারেই অপরিণত বয়সে তার বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের ৩ বছর পর রাবেয়া প্রথমবার গর্ভধারণ করে। বিয়ের পর গর্ভধারণে এই বিলম্ব ঘটেছে হয়তোবা বিলম্বে মাসিক শুরু হওয়ার কারণে। পরবর্তীকালে লক্ষ করা যায় যে, প্রতিটি প্রসব বা গর্ভপাত এবং গর্ভধারণের মধ্যবর্তী সময়টুকু তার ক্ষেত্রে খুবই কম। হয়তো রাবেয়া-দম্পতি কোনোরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেনি। রাবেয়া প্রথম ৩টি গর্ভাবস্থায় কোনো পরিচর্যা পায়নি। একদিকে ধনুষ্টংকারের টিকা নেওয়া হয়নি, অন্যদিকে প্রশিক্ষণ নেই এমন দাইকে দিয়ে সন্তান প্রসব করানো হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় সন্তানের মৃত্যুর লক্ষণ থেকে মনে করা যেতে পারে তারা ধনুষ্টংকারে মারা গেছে। চতুর্থবার গর্ভের লক্ষণ থেকে মনে করা যেতে পারে রাবেয়া প্রি-একলাম্পশিয়ায় ভুগছিলো। তার এবারের প্রসবের সময় একজন পাশ-করা ডাক্তার আনতে বিলম্ব করা হয়েছে। যমজ গর্ভ সনাক্ত করার পরও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সংগে সংগেই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। এখানেও আবার বিলম্বই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এমন এক সময়ে রাবেয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিলো যখন রক্ত এবং স্যালাইন দেওয়াতেও কোনো কাজ হয়নি।

শিশু-কিশোর বয়স থেকে অপুষ্টির কারণে পরিণত বয়সের পূর্বেই বিয়ে হওয়ায় এবং পরিচর্যাহীন ঘন ঘন সন্তান জন্ম দিতে দিতে ক্লান্ত রাবেয়া পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে দাঁড়িয়ে এ লজ্জাটুকু কার? আমার, আপনার, না কি সবার?

যা করণীয় ছিলো

রাবেয়াকে তার শারীরিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে বিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। রাবেয়া বাংলাদেশের যে-গ্রামের অধিবাসীই হোক না কেন, কোনো না কোনো মাঠকর্মী সেখানে অবশ্যই আছেন। তিনি রাবেয়া এবং রাবেয়ার পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। রাবেয়ার প্রয়োজন ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের; প্রয়োজন ছিলো গর্ভকালীন পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব এবং জরুরী প্রসূতি-সেবার। মাঠকর্মীর কাছেই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থাকে, গ্রাম-পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে গর্ভকালীন পরিচর্যা হয়ে থাকে, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই অবশ্যই আছে যাদের দ্বারা নিরাপদ প্রসব সম্ভব। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি-সেবা সর্বত্র নেই। তবে এ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে দ্রুত জেলা হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। রাবেয়া এবং তার পরিবারকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যেতো এবং সেবাদানকারীরা যদি নিষ্ঠাবান হতেন, তাহলে রাবেয়ার জীবনের এই করুণ পরিণতি ঘটতো না।

মাতৃমৃত্যু রোধে প্রয়োজন জনসাধারণের সচেতনতা এবং সেবা ব্যবস্থার সমন্বয়।

গুলেনবেরি সিনড্রোম (জিবিএস)

তারিক-উল-ইসলাম

গুলেনবেরি সিনড্রোম কী এবং কাদের হয়

স্নায়ুতন্ত্রের প্রদাহের কারণে যেসমস্ত রোগ বেশি হয় তার মধ্যে ইনফ্লেমেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিরেডিকুলো নিউরোপ্যাথি গুরুত্বপূর্ণ। এ-রোগটি গুলেনবেরি সিনড্রোম হিসাবে অধিক পরিচিত। ধারণা করা হয়: এটি একধরনের অটোইমিউন ডিজঅর্ডার। অর্ধেকেরও বেশি রোগী এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এক থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে কোনো ভাইরাল রোগে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য প্রদান করে, যেমন: সাইটোমেগালো ভাইরাস, হেপাটাইটিস ভাইরাস, এইপস্টেনবার ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, ইত্যাদি। কিছু রোগী অল্পদিন আগে করা হয়েছে এমন অস্ত্রোপচার, কিডনি প্রতিস্থাপন কিংবা টিকা গ্রহণের ইতিহাস জানায়। এছাড়া, যাদের কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে (হজ্‌কিন্‌স রোগ, লুপাস ইরাইথেমেটাস, এইডস্) তাদের মধ্যেও এ-রোগ দেখা যায়।

কী সমস্যা হয়

কয়েক ঘন্টা থেকে এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে গুলেনবেরি সিনড্রোমের পুর্ণ বিস্তৃতি ঘটে। শুরুতে পা কিংবা হাতের আঙুল অবশ হয়ে আসছে মনে হয়। ত্বকের নিচে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়; ধীরে ধীরে এই অবশতা শরীরের দুই পার্শ্বের মাংসপেশীকে একই গতিতে আক্রান্ত করে এবং উপরে উঠতে থাকে। সেন্সরী ক্রিয়ার মধ্যে ঝিম-ঝিম বা ব্যথা-ব্যথা ভাব হতে পারে, তবে সাধারণত তা তেমন প্রকট নয়। জিবিএস-এ শরীরের মারাত্মক অসাড়তা থেকে উদ্ভুত শ্বাসজনিত সমস্যার কারণে রোগী মারাও যেতে পারে। মাংসপেশীর দুর্বলতা বা অসাড়তা ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর রক্তচাপ বাড়তে বা কমতে পারে, হৃদস্পন্দন কমতে বা বাড়তে পারে, প্রস্রাব আটকে যেতে পারে। ক্রেনিয়াল নার্ভ আক্রান্ত হলে মুখের মাংসপেশী অবশ হতে পারে বা ঢোক গিলতে অসুবিধা হতে পারে। ডিপ রিফ্লেক্স কমে যেতে পারে বা অনুপস্থিত হতে পারে। ইলেকট্রোডায়গনস্টিক স্টাডিতে সিগমেন্টাল ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি পাওয়া যায় এবং স্নায়ুতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবহণ হয় এবং ইমপালস পরিবহণের গতিও কমে যায়।

মোটামুটি সুনিশ্চিতভাবে ক্লিনিক্যাল লক্ষণ থেকে জিবিএস সনাক্ত করা সম্ভব। রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার এক থেকে দুই দিনের মধ্যে এ-রোগ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চিকিৎসক কিছু কিছু পরীক্ষা করাতে পারেন। এসব পরীক্ষার পিছনে তিন ধরনের উদ্দেশ্য থাকে:

১. ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস সুনিশ্চিত করা
২. অন্য কোনো ডিজঅর্ডার আছে কি না তা জানা
৩. জিবিএস-এর পাশাপাশি কোনো অসুখ আছে কি না তা জানা

রক্ত পরীক্ষায় প্রয়োজনমত হেমাটোলজিক্যাল এবং বায়ো-কেমিক্যাল স্ক্রিনিং-এর প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে আছে এন্টি-নিউক্লিয়ার এন্টিবডি (ANA), হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি এন্টিবডি সনাক্তকরণ। পরফাইরিয়া এবং হেভী মেটাল পয়জনিং সন্দেহ হলে প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে। সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িডের (সিএসএফ) প্রোটিন, গ্লুকোজ এবং সেল কাউন্ট করতে হবে এবং প্রয়োজনে ভিডিআরএল টেস্ট করতে হবে। সিএসএফ-এ প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু সেল কাউন্ট স্বাভাবিক থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে এলবুমিনো সাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন। তবে রোগের প্রথম সপ্তাহে সিএসএফ-এর এই পরিবর্তন না-ও পাওয়া যেতে পারে। ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি শুধু রোগ নির্ণয়ে নয়, রোগ উপশমেও সহায়তা করে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডিতে মোটর ও সেন্সরী কনডাকশন স্টাডি এবং এফওয়েভ ল্যাটেন্সি ও এইচ রিফ্লেক্স ল্যাটেন্সি অন্তর্ভূক্ত।

চিকিৎসা

জিবিএস সন্দেহ হওয়ামাত্র রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো প্রয়োজন। কেননা রোগ শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রোগীর শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের সহায়তা সহজেই পেতে পারে এরকম হাসপাতালে রোগীকে রাখা প্রয়োজন। তবে যেসমস্ত রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে, মাংসপেশীর অসাড়তা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, শ্বাসনালী দুর্বল হয়ে গেছে বা নিঃসৃত মিউকাস ঠিকমত গলাধকরণ করতে পারছে না, তাদের সরাসরি ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করাতে হবে। রোগীর পালমোনারি ফাংশন, অটোনমিক ফাংশন, জেনারেল সাপোর্টিভ কেয়ার, সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা—সবদিকেই দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি এবং অটোরিয়াল রক্তের গ্যাস এ্যানালাইসিস শুরুতেই এবং কিছু সময় পরপর করতে হবে। যদি ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি রোগীর সাধারণ মাত্রার চেয়ে ১২-১৫ মিঃলিঃ/কেজি কমে যায় অথবা আর্টারির রক্তে অক্সিজেনের চাপ ৭০ মিঃমিঃ মার্কারির কম হয় অথবা পালমোনারি ফাংশন খুব দ্রুত অবনতির দিকে যায় তবে রোগীকে অবশ্যই ইনটিউবেট করতে হবে। রোগীর শ্বাসযন্ত্র অবশ হতে থাকলেও তাকে ইনটিউবেট করতে হবে। ইনটিউবেশনের সাহায্যে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস কৃত্রিমভাবে চালানো সম্ভব। রক্তচাপ কমে গেলে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুয়িডের মাধ্যমে তা ঠিক করতে হবে। সেকেন্ড অথবা থার্ড ডিগ্রী এ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার (এভি) ব্লকের ক্ষেত্রে বা হৃদস্পন্দন খুব কমে গেলে অস্থায়ী ডিমান্ড পেসমেকার লাগাতে হবে। জিবিএস-এর রোগীর জন্য পর্যাপ্ত ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করতে হবে এবং রেসপিরেটরি টয়লেটিং করাতে হবে, নতুবা এটিলেকটোসিস বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আধা ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে হবে নতুবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যায় বা কন্ট্রাকচার ডেভেলপ করে। রিস্ট ড্রপ এবং ফুটড্রপ এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে স্প্রিন্ট বা বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিদিন দুইবার করে চামড়ার মধ্যে (subcuteneous route) ৫০০০ ইউনিট হেপারিন দিতে হবে। এতে ডিপ ভেইন থ্রোমবোসিস কিংবা সেকেন্ডারি পালমোনারি এমবোলিজম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

জিবিএস-এর চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে প্লাজমা ফেরেসিস বা প্লাজমা প্রতিস্থাপন। এ-প্রক্রিয়ায় শরীর থেকে নির্দিষ্ট মাত্রার প্লাজমা বের করে নিয়ে বাইরে থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্লাজমা শরীরে দেওয়া হয়। রোগের প্রারম্ভিক পর্যায়েই প্লাজমা ফেরেসিস শুরু করা প্রয়োজন। তাহলে দ্রুত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্লাজমা ফেরেসিস তিন থেকে পাঁচবারের মতো করতে হতে পারে এবং প্রতিবার তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার ফ্লুইড প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমা ফেরেসিসের ক্ষেত্রে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার চেয়ে এলবুমিন এবং স্যালাইন প্রতিস্থাপন সুবিধাজনক। এতে হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে না।

যেসব ক্ষেত্রে প্লাজমা ফেরেসিস সম্ভব নয়, সেসব ক্ষেত্রে ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন জি (IgG) কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিদিন ৪০০ মিঃ গ্রাঃ/কেজি হিসাবে মোট পাঁচ দিন আইজিজি দিতে হয়। ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়ার ফলে কিছু ক্ষেত্রে মস্তিস্কের রক্ত সরবরাহের বিঘ্ন ঘটে কিংবা কিডনির কার্যক্ষমতাও বিঘ্নিত হতে পারে। জিবিএস-এ মিথাইল প্রেডনিসোল কিংবা অন্য স্টেরয়েডের কোনো কার্যকর ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না।

জিবিএস-এর রোগীর মানসিক সাহস বাড়াতে সাহায্য করতে হবে। রোগীকে বুঝাতে হবে: এই রোগ নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। প্রয়োজনে রোগীকে এরকম সুস্থ লোকের সাথে পরিচয় করাতে হবে যাদের পূর্বে এই রোগ হয়েছে।

উপশমের সম্ভাবনা

রোগের প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠার পর শতকরা ৭০ ভাগ রোগী পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। ১০ ভাগ রোগীর মাঝামাঝি ধরনের অবশতা বা দুর্বলতা থেকে যায়। শতকরা ৫ ভাগ রোগীর মারাত্মক ধরনের অবশতা দীর্ঘ সময় থেকে যায় এবং বাকি ৫ ভাগ রোগী রোগের যেকোনো পর্যায়ে সেপসিস, পালমোনারি এমবোলিজম ও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় মারা যায়।

পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি ব্যবহার করার আগে দেখে নিন বড়ির রং স্বাভাবিক কি না এবং পানিতে সহজেই গলে যায় কি না। তা না হলে বুঝতে হবে এই বড়ি ব্যবহারের উপযোগী নয়

স্বাস্থ্য কুইজ ২৩

১. কত বৎসর বয়সের আগে ও পরে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়?

২. যৌনরোগ কী? বাংলাদেশে সচরাচর সংক্রমণকারী দু'টি যৌনরোগের নাম লিখুন।

৩. মহিলাদের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ যৌনমিলন ছাড়া অন্য কিভাবে হতে পারে?

৪. কত বৎসর বয়স থেকে মহিলাদের প্রথম ডোজ টিটি টিকা নিতে হয়? মোট কয় ডোজ টিকা নিতে হয় এবং তাদের সময়সূচি কী?

৫. শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোকালীন সময়ে সাধারণত কোন্ ৪টি কারণে মায়ের আবার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

[প্রশ্নগুলোর উত্তর ১০ জানুয়ারী ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে পৌছাতে হবে]

স্বাস্থ্য কুইজ ২২-এর উত্তর

১. শিশুর শ্বাসতন্ত্রের হঠাৎ সংক্রমণের (ARI) সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি: শিশুর জন্ম-ওজন ২.৫ কেজির কম হয়, সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো না হয়, পুষ্টিহীনতায় ভোগে, ৬টি মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকা না নেয়, ভিটামিন এ-এর অভাব থাকে, দুষিত পরিবেশে (ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে, ঘনবসতিপূর্ণ, ধোঁয়াপূর্ণ জায়গা) থাকে, শিশু হাম সংক্রমণে আক্রান্ত হয়।

২. বিশোধন বা Decontamination স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দূষণমুক্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক ধাপ। এই ধাপে ০.৫% ক্লোরিন দ্রবণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়া হেপাটাইটিস বি ও HIV সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে।

৩. অন্য কোনো যৌনরোগে আক্রান্ত হলে HIV ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ২-১০ গুণ বেড়ে যায়, কারণ অধিকাংশ যৌনরোগের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের যৌনাঙ্গে ক্ষত হয় এবং HIV ভাইরাস ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে সহজে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

৪. পাঁচটি নিরাপদ যৌন-অভ্যাস: (১) বিবাহপূর্ব যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা, (২) একজনমাত্র বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গীর সাথে যৌনমিলনকে সীমিত রাখা, (৩) পায়ুপথে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা, (৪) যৌনসঙ্গীর প্রতি নিজে বিশ্বস্ত থাকা এবং (৫) ঝুঁকিপূর্ণ যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করা।

৫. ফোঁড়ার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ : (১) শরীরের নির্দিষ্ট জায়গা শক্ত ও ফোলা এবং (২) সেই জায়গাটুকুর তাপ বৃদ্ধি পাওয়া ও ব্যথা করা।

মাংসপেশীতে, বগলে, স্তনে, দাঁতের গোড়ায়, ঘাড়ে এবং টনসিল-সংক্রান্ত ফোঁড়া হলে রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবার পরামর্শ দিন।

[সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ-ই দিতে পারেন নি]

জেনে রাখা ভাল

সম্প্রতি আমাদের দেশে ভয়ংকর এক বন্যা হয়ে গেলো। বন্যার ফলে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে চর্মরোগ অন্যতম। আশ্রয় কেন্দ্রে অল্প জায়গায় অধিক লোকের বাস, গোসল করতে না-পারা, পরিধেয় কাপড় অপরিষ্কার হয়ে-যাওয়া, ঘনঘন নোংরা পানির সংস্পর্শে আসার কারণে বন্যার সময় এবং বন্যা-পরবর্তী সময়ে শরীরে ব্যাপকভাবে চুলকানি দেখা দিতে পারে। চুলকানি রোগ ডায়রিয়া এবং এআরআই-এর মত মারাত্মক রোগ না হলেও এটি এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং ব্যবস্থা নিতে অবহেলা করলে বিভিন্ন জটিলতা এমনকি কিডনি রোগের মত মারাত্মক রোগও দেখা দিতে পারে।

চুলকানি রোগের জন্য একজাতীয় পরজীবী কীট দায়ী। আমাদের শরীর এবং কাপড়-চোপড় অপরিচ্ছন্ন হলে এই কীট আমাদের চামড়াকে আক্রান্ত করে। প্রাথমিক অবস্থায় লাল রংয়ের ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয়। শরীরের যেকোনো স্থানে চুলকানি হতে পারে। তবে হাত-পায়ের আঙুলের ফাঁকে, কব্জির চারপাশে, বগলে, নিতম্বে, পুরুষাঙ্গে বেশি দেখা যায়। চুলকানোর ফলে ফুসকুড়িগুলি ক্ষতস্থানে পরিণত হয় এবং পূঁজ জমে ওঠে। আক্রান্ত স্থানের লসিকা গ্রন্থিগুলো ফুলে ওঠে এবং ব্যথা হয়। জ্বরও হয়ে থাকে। চুলকানি একটি ছোঁয়াচে রোগ এবং দ্রুত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে চুলকানির খুব কার্যকর দেশীয় চিকিৎসা প্রচলিত আছে। নিমপাতা এবং কাঁচা হলুদ বেটে ভাল করে মিশিয়ে শরীরে মাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে চুলকানি যদি পুঁজযুক্ত হয় তাহলে প্রথমে মাত্রানুযায়ী ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন দিয়ে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পুঁজ সেরে যাবার পর বেনজাইল বেনজোয়েট লোশন (বিবি লোশন) নিম্নের বিধি অনুযায়ী গায়ে লাগানো প্রয়োজন:

লোশন	শিশুদের ক্ষেত্রে	বয়স্কদের ক্ষেত্রে
বিবি ২৫%	১ ভাগ ওষুধ+১ ভাগ পানি	তরলীকরণ প্রয়োজন নেই
বিবি ৯০%	১ ভাগ ওষুধ+৭ ভাগ পানি	১ ভাগ ওষুধ+৩ ভাগ পানি

সাবধানতা: ওষুধটি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, কারণ এই বিষাক্ত ওষুধ শিশু ভুলক্রমে খেয়ে ফেলতে পারে যার পরিণাম মারাত্মক। বিবি লোশন মাথা, মুখমন্ডল এবং অন্ডথলিতে ব্যবহার করা যাবে না।

রোগীরা প্রায়শ যে সমস্যা নিয়ে সেবাদানকারীর কাছে আসেন তা হলো, "ওষুধ ব্যবহার করলাম, কিন্তু ভালো হইলো না। এমন ওষুধ দেন যাতে নাড়ের ভেতর থেকে রোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" সাধারণ ধারণা হলো: রোগটা শরীরের গভীরে বা রক্তে মিশে আছে। ওষুধ ব্যবহারে সাময়িক ভালো হলেও ধ্বংস হয় না। এ-ধারণা ঠিক নয়। আসলে চুলকানি সেরে উঠার পরও পরিচ্ছন্নতার

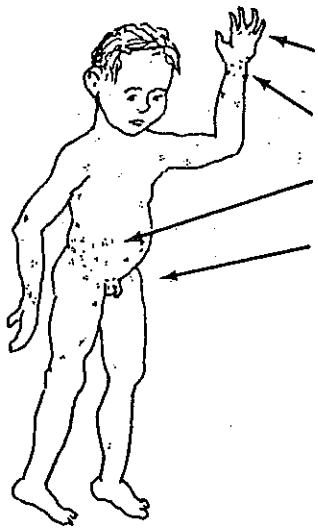

স্কেবিস সংক্রমণের সাধারণ জায়গাসমূহ
সূত্র : স্বাস্থ্যসেবার রেফারেন্স ম্যানুয়েল

নিয়ম পালনে গাফিলতি করলে পুনরায় সংক্রমণের কারণেই আবার চুলকানি শুরু হয়। আমরা জেনেছি যে এ-রোগের প্রধান কারণ একটি পরজীবী কীট। তাকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তাকে ধ্বংস করতে হলে ওষুধ ব্যবহারের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত নিয়মগুলো মানা আবশ্যক :

- নিমপাতা বা ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে ভালো করে সাবান দিয়ে রগড়িয়ে গোসল করে শরীর শুকিয়ে নিতে হবে।
- পরপর ৩ দিন নিমপাতা/ওষুধ লাগাতে হবে এবং এসময় গোসল করা যাবে না।
- সেরে না উঠলে ৭ দিন পর একই নিয়মে পুনরায় ওষুধ/নিমপাতা ব্যবহার করতে হবে।
- ওষুধ বা নিমপাতা ব্যবহারের পর পরিধেয় কাপড়-চোপড় সোডা দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। যেসব কাপড় ধোয়া সম্ভব নয় যেমন, কাঁথা, বালিশ—এগুলো পর পর কয়েকদিন কড়া রোদে দিতে হবে।
- পরিবারের সকল সদস্য (এক বাড়িতে যাঁরা থাকেন) একই নিয়মে প্রত্যেকের নিমপাতা/ওষুধ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চুলকানির সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্নতা থেকে। তাই পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলে চুলকানি প্রতিরোধ করা সম্ভব

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক জর্জ ফুশ; **সম্পাদক** ঃ ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক** ঃ এম. শামসুল ইসলাম খান
সদস্য ঃ ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ মহসীন আহমেদ, ডাঃ হাসান আশরাফ ও এম. এ. রহীম; **ডিজাইন** ঃ আসেম আনসারী
প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৮৭১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬
টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বিজে.; ই-মেইল ঃ msik@icddrb.org

মুদ্রণে ঃ ব্র্যাক প্রিন্টার্স বাংলাদেশ